যুগান্তর

তারিখ ..10 OCT..2015...
পৃষ্ঠা ...(৫)... কলাম......

এ কে এম শা হ না ও য়া জ

শিক্ষকদের এটি পাওনা ছিল

খুবই বিব্রতকর অবস্থায় এবং কিছুটা মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে আছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে বসেছিলেন। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া যেহেতু সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা কারও নেই, তাই অযথা অর্থমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রীর নসিহত শুনে সময় নষ্ট করার পক্ষে অনেকেই ছিলেন না। সাধারণ প্রত্যাশা ছিল, বরাবরের মতো নিজ প্রজ্ঞা দিয়ে সংকটটি অনুধাবন করবেন প্রধানমন্ত্রী এবং যৌক্তিক সমাধানের দিকনির্দেশনা দেবেন। কিন্তু আমাদের বহু প্রতীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত শব্দমালা যেভাবে উচ্চারিত হল, তাতে শিক্ষকদের প্রত্যাশার বেলুন মুহূর্তে ফুটো হয়ে চুপসে গেল। আর যে মর্যাদা ফিরে পাওয়ার 'লোভে' উদ্বাহু ছিলেন শিক্ষকরা, তার অবমাননার কথা শুনে ধপাস ধরণীপাত হলেন। আমি বিব্রতকর অবস্থায় পড়লাম খুবই সাধারণ একটি কারণে। মাত্র ক'দিন আগে শিক্ষক লাউঞ্জে আন্দোলন প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমার এক বিএনপি ঘরানার বন্ধু বাঁকা হাসি দিয়ে বলেছিলেন, আমলা নিয়ন্ত্রিত সরকারে এসব আন্দোলনের মূল্য নেই। আমি বলেছিলাম— বেশ আস্থার সঙ্গেই বলেছিলাম, প্রধানমন্ত্রীকে দেশে আসতে দিন। তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা। বঙ্গবন্ধু সবসময় শিক্ষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শেখ হাসিনাও সেই ঘরানা থেকে বেড়ে উঠেছেন। শিক্ষকদের অহংবোধের জায়গাটি তিনি ঠিকই বুঝতে পারবেন। এখন আমি দুদিন ধরে আমার সেই সহকর্মীকে এড়িয়ে চলছি।

প্রধানমন্ত্রী যখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা শিক্ষকদের অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে সমালোচনা করছিলেন, তখন আমার ১৯৪৮-এর কথা খুব মনে পড়ছিল। ততদিনে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়ে গেছে। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিকে অগ্রাহ্য করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারাও কোনো সম্মান দেখাননি। এমন এক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বক্তৃতা করতে আসবেন পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। বাঙালির প্রত্যাশা ছিল, পিতা নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণের দাবিকে অনুভব করবেন। একটি সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু জনসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে সবাইকে হতাশ করে দিয়ে বললেন, 'উর্দু অ্যান্ড অনলি উর্দু শ্যাল বি দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান।'

আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের কঠিন কয়েকটি লাইন নিয়ে ভাবছিলাম। মেলাতে পারছিলাম না। নানা ক্ষেত্রে তিনি তার প্রাজ্ঞ আচরণের প্রমাণ রেখেছেন। দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিতে দৃঢ় ভূমিকা রেখেছেন এবং রাখছেন। এ নিয়ে উদ্বেলিত হয়ে আমি কলামও লিখেছি। ক্লাসে উত্থান-বিকাশ-পতন ও নবোউত্থান চক্রের কথা বলছিলাম ছাত্রছাত্রীদের। যোগ করেছিলাম [illegible] বলে যে, চক্রের সূত্র অনুযায়ী নবোউত্থানের পর্বে এখন আমরা। কাউকে না কাউকে নবোউত্থানের দিকে চক্রটাকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। পূর্বাপর বিচারে আমার মনে হচ্ছে, এ ঐতিহাসিক ভূমিকাটি পালন করতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা।

তেমন একজন জননেত্রী তেমন কোনো তথ্যসূত্র ছাড়া এতসব শব্দবাণ ছুড়লেন কেমন করে? সম্মান ফিরে পাওয়ার দাবিতে আসা শিক্ষকরা লাঞ্ছিত হলেন। এর মধ্যে টকশোতে, পত্রিকার পাতায় 'বিস্মিত অনেকেই বলছেন, দেশের মাটিতে পা দিতেই কোনো মহল শিক্ষকদের দাবির প্রসঙ্গটি খুব বাজেভাবে উপস্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। যে কারণে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। হয়তো এ বক্তব্যের সারবত্তা আছে। তবে বিনয়ের সঙ্গে একথাও বলব, একজন সরকারপ্রধান এ ধরনের কান কথাকে বিশ্বাস করলে তো ভয়ানক বিপদ। আমার মনে হয়, যারা প্রধানমন্ত্রীকে বিপদগ্রস্ত করতে চান, তাদের ব্যাপারে নিশ্চয়ই সতর্ক থাকা উচিত।

তবে আমি ভাবছি অন্য কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি আমলা, মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সবাই ক্ষুব্ধ কেন? শিক্ষকদের সবাই সুযোগ পেলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছেন! সত্তর ও আশির দশকেও তো এমন ছিল না। অনেক শিক্ষক রাজনীতিকদের গাইড ও ফিলোসফার ছিলেন। একটি কারণ শনাক্ত করা যায়। এ সময় শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতিতে নিজেদের জড়াননি। আত্মমর্যাদা বোধ নিয়ে তারা নিজেদের শিক্ষা ও গবেষণা কর্ম চালিয়ে যেতেন। এখনও তেমন শিক্ষকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু দলীয় রাজনীতির অনুগতরা এসব শিক্ষককে আড়াল করে রাখেন। এখন তাই পাণ্ডিত্য বিচারে কেউ ভিসি হতে পারেন না যে, সব সময় মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারবেন। ভিসি হওয়ার তদবির করতে যেভাবে অনেকে মন্ত্রী-আমলা আর ক্ষমতাধর রাজনীতিকদের কাছে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকেন বলে শুনি, সেক্ষেত্রে পরে তাদের ওপর তারা স্বাভাবিকভাবেই ছড়ি ঘোরাবেন। এ সামান্য চাওয়া-পাওয়ার কাছে এভাবে যখন রাজনীতিক শিক্ষকরা নিজেদের মর্যাদা বিকিয়ে দেন, তখন শাসকগোষ্ঠী তাদের কেন সম্মান বিলিয়ে দেয়ার জন্য বসে থাকবে? আর এসব শিক্ষক প্রধানমন্ত্রী থেকে আমলাদের কাছে পর্যন্ত এতটাই ভিড় করে থাকেন যে, তাদের কারণে আড়ালে থেকে যান সিংহভাগ দায়িত্বজ্ঞান আর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জ্ঞানচর্চায় নিবেদিত শিক্ষক।

সঠিক তথ্যের অভাবে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, তার কাছে শিক্ষকদের তালিকা আছে কারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াতে যান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর ওই তালিকায় তো থাকবে মোট শিক্ষকের শতকরা সাত-আট ভাগ। তাদের জন্য ৯২-৯৩ ভাগ শিক্ষক ফাঁসির মঞ্চে যাবেন কেন? তাছাড়া ঘুষ-দুর্নীতি নয়, নিজ পেশাগত দায়িত্ব পালনের পর নিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে নিজ মেধা ও শ্রম দিয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করায় অপরাধটি কোথায়? অমন কথা বলার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খণ্ডকালীন শিক্ষকতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করাটা কি জরুরি নয়? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের তালিকা রেখেছেন এজন্য তাকে ধন্যবাদ। তবে আমাদের জানা হল না দুর্নীতিতে ছেয়ে যাওয়া দেশের রাজনৈতিক দুর্নীতিবাজ আর আমলা, দুর্নীতিবাজদের তালিকা তিনি রেখেছেন কি-না। একটু ধোঁয়াশা থেকে যায় যখন প্রধানমন্ত্রী সচিবদের অনেকটা এগিয়ে দিয়ে বলতে চান, শিক্ষক খণ্ডকালীন পড়ান আর আমলারা একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চাকরিই করে যান। এ সমাজে বসে প্রধানমন্ত্রীর তো অজানা থাকার কথা নয় কার আয়ের উৎস কী।

> এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ শিক্ষক সমিতি সরকারি দলের সমর্থক। অন্তত সরকারি দল সমর্থক শিক্ষকদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেশি। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনে শিক্ষক নেতাদের অবস্থানও অনেকটা অভিন্ন। এ আন্দোলনে সরকারের অস্বস্তি কম থাকার কথা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সরকারের ভেতর যে সরকারটি আছে তারা জাত সাপের পূজা করেন, ঢোরা সাপকে পাত্তা দেন না। কাগজে দেখলাম, শিক্ষকদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে সাংবাদিকরা ফেডারেশন নেতাদের প্রতিক্রিয়া চেয়েছিলেন। সুকৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন নেতারা। এর দুটো কারণ থাকতে পারে— তারা হয় প্রধানমন্ত্রীকে না চটানোর কৌশল নিয়েছেন, নয়তো নিজেদের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার কারণে কণ্ঠ চড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন।

তথ্যসূত্র ছাড়া মন্তব্য করাটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। শিক্ষকদের নিন্দা করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী সাম্প্রতিককালে বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রমোশন পান। এ কথার সূত্র কী আমি জানি না। তবে আন্দাজ করতে পারি। কারণ আমাদের এ ক্ষমতাধর রাজনীতিকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ক্ষতি করেছেন। যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার কথা নয় এমন প্রার্থীদের দলীয় ক্যাডার হওয়ার যোগ্যতায় এবং নানা রকম অনুরাগের বশবর্তী হয়ে জোর তদবির করে শিক্ষক বানানো হয়। প্রমোশনেরও ব্যবস্থা করা হয়। এ অস্বচ্ছতা সিংহভাগ সাধারণ শিক্ষকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। খুব বর্বর উদাহরণ হবে, তবু অন্য কারও সব তথ্য আমার হাতে নেই বলে খুব বিব্রত হয়েও নিজেকে দিয়েই উদাহরণ দিতে হচ্ছে। আশা করি পাঠক ক্ষমা করবেন। প্রায় ৩২ বছর আগে আমি যখন শিক্ষক হই তখন লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি ছিল না। মেধাবীদেরই শিক্ষক করা হতো। অন্য কোনো পরিচয়ে নয়। অনার্স ও মাস্টার্সে আমি সর্বোচ্চ ফল করেছিলাম। কিন্তু বিভাগে প্রভাষকের পদ ছিল না। অন্য এক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষকতায় যোগ দেয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে আমার অজান্তে বিভাগের সভাপতি আমার শিক্ষক প্রয়াত অধ্যাপক আবু ইমাম স্যার ও ভিসি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী স্যার জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আমাকে শিক্ষক বানিয়ে ফেললেন। এরপর দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে শিক্ষক রাজনীতির অন্ধকার ছায়া পড়তে দেখেছি বারবার। শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকার অপরাধে আমার প্রমোশন হতে থাকল ধীরে ধীরে। তারপরও বলব, কোনো অস্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রমোশন হয়নি। নির্ধারিত নীতিমালা মেনেই হয়েছে। এই যে সিলেকশন গ্রেড নিয়ে এখন অনেক কথা হচ্ছে, এ গ্রেড পাওয়াটাও কি অত সহজ? মাত্র ২৫ ভাগ শিক্ষককে নাকি ধাপে ধাপে এ গ্রেডে আনা হয়। অল্প কয়েক মাস আগে আমি সিলেকশন গ্রেডে গিয়েছি। ততদিনে আমার শিক্ষকতার বয়স ৩১ বছর পেরিয়ে গেছে। প্রায় ৩০টি গবেষণা প্রবন্ধ দেশী-বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। আমার লেখা স্কুল-কলেজের পাঠক্রমভিত্তিক ও গবেষণা গ্রন্থের সংখ্যা ২০টিরও বেশি। এসব বইয়ের অনেকগুলো দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে পাঠ্য। আমার তত্ত্বাবধানে ছয়জন গবেষক পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, কম-বেশি এমন বায়োডাটা অধিকাংশ শিক্ষকের। সুতরাং যারা শিক্ষকদের মাথা ও ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছড়ি ঘোরাতে পছন্দ করেন, তাদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করার কোনো রুচি আমার নেই। আমি বরাবর বিশ্বাস করি, লেজুড়বৃত্তির শিক্ষক রাজনীতি আমাদের অহমিকার জায়গাটি অনেকটা দুর্বল করে ফেলেছে। আর এর সুবিধা বিধায় করা ঠিক আদায় করে নিতে পারছেন।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ শিক্ষক সমিতি সরকারি দলের সমর্থক। অন্তত সরকারি দল সমর্থক শিক্ষকদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেশি। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনে শিক্ষক নেতাদের অবস্থানও অনেকটা অভিন্ন। এ আন্দোলনে সরকারের অস্বস্তি কম থাকার কথা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সরকারের ভেতর যে সরকারটি আছে তারা জাত সাপের পূজা করেন, ঢোরা সাপকে পাত্তা দেন না। কাগজে দেখলাম, শিক্ষকদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে সাংবাদিকরা ফেডারেশন নেতাদের প্রতিক্রিয়া চেয়েছিলেন। সুকৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন নেতারা। এর দুটো কারণ থাকতে পারে— তারা হয় প্রধানমন্ত্রীকে না চটানোর কৌশল নিয়েছেন, নয়তো নিজেদের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার কারণে কণ্ঠ চড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। যদি শেষেরটি সত্য হয় তবে বলব, এমন বকাঝকা শিক্ষকদের প্রাপ্য ছিল এবং অমন বকা খাওয়ার জন্য ভবিষ্যতেও তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

ড. একেএম শাহনাওয়াজ : অধ্যাপক, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
shahnawaz7b@gmail.com